MAGAZINE October 2017

Contents

1. শ্রদ্ধার্ঘ	রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা	অমিত কুমার সেনগুপ্ত (প্রবীর সেনগুপ্তর ভাই)	Page 1 – 4
2. কবিতা	নীল তিমি লাল মাছ	রঞ্জন প্রসাদ BEC 69 (Arch.)	Page 5
3. প্রবন্ধ	পাণ্ডবজায়া দ্রৌপদী	অভিজিৎ দাস	Page 6 – 10
4. আলোচনা	আবার ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা	দীপক ভট্টাচার্য BEC 69 (Met)	Page 11 - 17
5. কবিতা	মহানন্দের খোঁজে	অধীর দাস BEC 69 (Civil)	Page 18 - 19
6. প্রবন্ধ	স্ট্যাচু অফ ইকুয়ালিটি	অধীর দাস BEC 69 (Civil)	Page 20 - 23

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

(জন্মের সার্ধশতবর্ষে সশ্রদ্ধ নিবেদন)

অমিত সেনগুপ্ত

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা" -এই নামেই তিনি সবসময় নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতা (Margaret Elizabeth Noble) ছিলেন একজন আইরিশ বংশোদ্‌ভূত সমাজকর্মী, লেখিকা, শিক্ষিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। Northern Ireland-এর ছোট্ট শহর Dungannon-এ ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ঘটেছিল এই মহাজীবনের অবসান। তাঁর বাবা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল ছিলেন প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজক এবং মায়ের নাম ছিল মেরী ইসাবেল হ্যামিল্টন নোবেল। মার্গারেটই ছিলেন তাঁদের প্রথম সন্তান। তিনি ছাড়াও তাঁর আরও দুই বোন ও এক ভাই ছিল। তিনি তাঁর বাবার কাছে শিক্ষা পান যে 'মানব সেবাই, ঈশ্বর সেবা'। বাবার আদর্শ তাঁর পরবর্তী জীবনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর বাবা সঙ্গীত এবং শিল্পকলারও একজন বোদ্ধা ছিলেন।

মার্গারেটের বয়স যখন মাত্র এক বছর তখন তাঁকে তাঁর দাদামশাই ও ঠাকুমার কাছে রেখে জীবিকার সন্ধ্যানে তাঁর বাবা-মা ডানগ্যানন ছেড়ে ম্যাঞ্চেষ্টারে চলে যান। সেই সময় আয়ারল্যান্ড ছিল ইংল্যান্ডের শাসনাধীন। ইংল্যান্ডের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হবার জন্যে আয়ারল্যান্ডে চলছে গণ-জাগরণ। ফলে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত। এই আবহাওয়ার মধ্যে বেড়ে উঠার সুযোগে মার্গারেটের মন প্রস্‌ফুটিত হয়েছিল বিপ্লবের স্বপ্নে। সেই স্বপ্ন লালিত হয়েছে দাদামশাই ও ঠাকুমার আদর্শ ও প্রেরণায়। জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর ভাবনার উন্মেষ হয়েছিল বাড়ির বৈপ্লবিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। কয়েক বছর পরে, তাঁর বাবা-মা কিছুটা স্থিত হলে মেয়েকে তাঁদের কাছে নিয়ে যান। মার্গারেটের বয়স যখন মাত্র দশ বছর, তখন তাঁর বাবা মারা যান। তারপর তাঁর দাদামশাই তথা আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী হ্যামিলটনই তাঁকে লালন-পালন করেন।

হ্যালিফ্যাক্স স্কুলের ছাত্রী, মার্গারেটের বয়স যখন মাত্র তেরো, তখন তিনি সাহিত্যের শিক্ষিকা মিস কলিনকে একটি প্রশ্ন করে চমকে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "জীবনের শেষ কোথায়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি?" অতটুকু মেয়ের মুখে গভীর জীবনবোধের এমন প্রশ্ন মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। তবে প্রতিভা তো এমন বিশেষ পথ ধরেই এগোয় - গতানুগতিক পথ তো তার নয়। এই একটা প্রশ্নের মধ্য থেকেই সেদিন তাঁর প্রতিভার পরিচয় পান সেই দূরদর্শিনী শিক্ষিকা, মিস কলিন। যদিও সেদিন মিস কলিন মার্গারেটের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেননি।

সেই শিক্ষিকাকে একদিন মার্গারেট জানালেন, ঈশ্বর যে আছেন তা বিশ্বাস করতে তাঁর ভালো লাগে, তিনি তাঁকে জানতে চান, বুঝতে চান। প্রশ্ন করলেন, "কি করে ঈশ্বরকে জানা যায়?" মিস কলিন সেদিন আপ্লূত হয়েছিলেন মার্গারেটের প্রশ্ন শুনে। তিনি বললেন, "তাঁর সম্পর্কে জান, তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। তার মাধ্যমেই তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হবে। ঈশ্বর তো স্বচ্ছ স্বয়ং প্রকাশ, অজানার অন্ধকার দূর হলেই, তাঁর প্রকাশ প্রত্যাক্ষ হয়। তোমার মধ্যে তাঁর লীলা মূর্ত হয়ে উঠুক।"

সেদিনের সেই শিক্ষিকার আন্তরিক অভিপ্রায় উত্তরকালে মার্গারেটের জীবনে পরিস্‌ফুট হয়ে উঠেছিল এবং এই রকম গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই মার্গারেটের ব্যাক্তিত্বের বিকাশ লাভ করতে থাকে। এই সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের বিপ্লব চেতনাও তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করে চলল। তিনি তীব্রভাবে অনুভব করলেন, তাঁরও কিছু করার আছে, দেশকে কিছু দেওয়ার দায়িত্ব আছে। ইংরাজের অন্যায় শাসন-শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পারলে, আইরিশ জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

এইসব চিন্তার মধ্যে দিয়েই মার্গারেটের বিপ্লবী সত্তা জেগে উঠল। ধীরে ধীরে তিনি জড়িয়ে পড়লেন আইরিশ হোমরুল আন্দোলনের সাথে। উপলব্ধি করলেন দেশে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটাতে হলে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষাই তৈরি করে জাতির মেরুদন্ড। ১৮৮৪ সালে সসম্মানে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হয়ে, তিনি শিক্ষকতার জীবনই বেছে নিলেন। ১৮৮৬ সালে রেক্সহামে, ১৮৮৯ সালে চেস্টারে এবং ১৮৯০ সালে উইম্বলডনে পড়াবার পর, ১৮৯২ সালে উইম্বলডনেই 'রাস্কিন স্কুল' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। সেই স্কুলে শুধু শিশুদেরই শিক্ষা দেওয়া হোত না, শিক্ষায় আগ্রহী বড়রাও পড়ার সুযোগ পেত।

কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও আধ্যাত্মিক ও বিপ্লবী চিন্তা তাঁর মধ্যে

নিরন্তর আত্ম-জিজ্ঞাসার আলোড়ন তুলেই চলল। প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে জীবন চলতে লাগল। এই সময় গেলোয়াক নামে এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগেই গেলোয়াকের আকস্মিক মৃত্যু হয়। এর পরে আর এক জনের সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্ভবনা দেখা দেয়, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে ধর্ম ও গতানুগতিক ব্যবস্থাসমূহের ব্যাপারে তাঁর মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে। তিনি যুক্তিহীন কোনও কিছুই আর মেনে নিতে চান না। এই সময়ই তাঁর পরিচয় হয় রুশ বিপ্লবী ক্রোপোটকিনের সঙ্গে। তাঁর প্রভাব মার্গারেটের চরিত্রকে (বিপ্লবী চেতনায়) বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তা ছাড়া শিল্প শহরে বড় হয়ে ওঠার ফলে শিল্পের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই ছিল। এই আকর্ষণের পরিণতি হিসাবে তিনি হয়ে ছিলেন লন্ডনের ডোভার স্ট্রীটে অবস্থিত শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা কেন্দ্র 'সিসেম ক্লাবের' সদস্য ও পরের দিকে তিনি সেই ক্লাবের সম্পাদক হন। সেই সময় বার্ণাড শ, হ্যাক্সলি প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এছাড়া আয়ারল্যান্ডের সিন-ফিন বিপ্লবী সংগঠনের অনেক সদস্যের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল।

তারই মধ্যে ১৮৯৫ সালে তিনি অ্যাংলিকান চার্চের ফ্রি থিঙ্কার (Free Thinker) দলের সঙ্গে যুক্ত হন। আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে চলেছিল মার্গারেটের প্রতিভা। কিন্তু ক্ষেত্রের অভাবে বার বার প্রতিহত হচ্ছিল তাঁর উদ্যোগ। গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। অসহিষ্ণুতা আর গোঁড়ামি পদে পদে। সেবাধর্মের এমন অন্তঃসারশূন্যতা দেখে তিনি পীড়িত হলেন। অন্যদের আত্মপ্রচারের হীন স্বার্থ, সেবাধর্মকে মর্মহীন ভন্ডামিতে পরিণত করছিল। এ কি করে তিনি মেনে নেবেন? মনের মধ্যে এই ভীষণ হাহাকার ও আর্ত্তি নিয়ে পথ হাতরে চলেছেন তিনি। কোথায় পাবেন মুক্ত উদার বাধাবন্ধহীন পথ, যে পথ তাঁকে পৌঁছে দেবে পরম সত্যের কাছে?

এদিকে ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে সর্ব্বধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা ইউরোপ আলোড়িত হয়েছে হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জয়-জয়কারে। খবরের কাগজের পাতা জুড়ে কেবল তাঁরই খবর। ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে এসেছেন। মার্গারেট জানতে পারলেন ১৫ই নভেম্বর লেডি ইসাবেল মার্গসনের বাড়িতে সন্ধ্যে বেলায় একটি আলোচনা সভায় স্বামী বিবেকানন্দ আসছেন। শ্রোতা হিসাবে মার্গারেটও নিমন্ত্রণ পেলেন সে আলোচনা সভায়। মার্গারেটের অন্তর জুড়ে অতৃপ্তি আর মন জুড়ে আছে অন্বেষণ। কোথাও স্থির হতে পারছিলেন না। তাই তিনি সম্মত হয়ে সেই আলোচনা সভার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। এই আলোচনা সভাতেই তিনি প্রথম স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেন এবং স্বামীজির বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা শোনেন। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মব্যাখ্যায় তিনি মুগ্ধ হলেন। এর পর লন্ডনে, স্বামীজির প্রতিটি বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর সভায় উপস্থিত থাকেন। ১৫ই নভেম্বররের প্রথম সাক্ষাতেই স্বামীজির চিন্তাধারা তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। সেই দিনই যেন মুগ্ধ বিমোহিত মার্গারেটের প্রতিভা আত্মমুক্তির সন্ধান পেল। আকৃষ্ট হলেন ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রতি। তারপর স্বামী বিবেকানন্দকেই নিজের গুরু বলে বরণ করে নেন এবং গ্রহণ করেন স্বামীজির শিষ্যত্ব।

পরবর্তী দুই বছর ধরে তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নেন, দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। সেই সূত্রে ১৮৯৭ সালে স্বামীজির কাছে প্রস্তাব পাঠান যে তিনি ভারতবর্ষে এসে সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চান। বিশেষত মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারেই তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তাঁর এই প্রস্তাব স্বামীজি অনুমোদন করার পর মার্গারেট ১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি পরিবার পরিজন ত্যাগ করে কোলকাতায় এসে পৌঁছান। স্বামীজির সান্নিধ্যে তিনি লাভ করলেন তাঁর আদর্শ কর্মক্ষেত্র। বিদেশিনী মার্গারেটকে সেবার অধিকার দিতে হলে, আগে তাঁকে অর্জন করতে হবে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

তাই স্বামীজি মার্গারেটকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে ১৮৯৮ সালের ১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে এক সভার আয়োজন করলেন। স্বামীজিই ছিলেন সে সভার সভাপতি। স্বামীজির মানস-কন্যা এবং শিষ্যা মার্গারেটকে নিবেদন করলেন দেশের কাছে, দেশের সেবার জন্যে। করতালি মুখরিত সভায় অভিনন্দিত মার্গারেট হলেন অভিভূত। মার্গারেট তাঁর বক্তৃতায় বললেন, "পৃথিবীর মহত্তম আধ্যাত্মিক সম্পদ রয়েছে ভারতবর্ষের সঞ্চয়ে। যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী এই সম্পদ ধারণ ও বহন করে আসছে। সেই মহান সম্পদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে, ভারতবর্ষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে আমি ভারতবর্ষে এসেছি। আমি সকলের সহানুভুতি ও সহায়তা কামনা করি।" স্বতঃস্ফুর্ত আগ্রহে করতালির মধ্যে মার্গারেটকে বরণ করে নিলেন ভারতবাসী। স্বামীজি মার্গারেটকে পরিচয় করিয়ে দেন, 'ইংল্যান্ডে আমার কর্মধারায় প্রস্ফুটিত সর্বোত্তম পুষ্প' বলে।

মার্গারেট হলেন ভারতের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, "সিস্টার নিবেদিতা"। স্বামীজিই এই নামকরণ করেছিলেন। সেই দিন (১৮৯৮ সালের ১১ই মার্চ) থেকেই তিনি হন "ভগিনী নিবেদিতা"।

এর কয়েকদিন পর ১৭ই মার্চ (প্রথমবার) তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ২৫শে মার্চ স্বামীজির কাছে পেলেন ব্রক্ষচর্যের দীক্ষা। এর পর ১৩ই নভেম্বর মায়ের উপস্থিতিতেই, ১৬ বোসপাড়া লেনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'। সেই সময় স্কুলের নাম রাখা হয়েছিল 'রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস'। স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে বিবেকানন্দের কাছে ভারতের দর্শন ইতিহাস, সাহিত্য, জনজীবন, সমাজতত্ত্ব, প্রাচীন ও আধুনিক মহাপুরুষদের জীবন কথা শুনে নিবেদিতা ভারতকে চিনতে শেখেন। সেই সময়ই কোলকাতায় ভীষণ প্লেগের মহামারী দেখা দেওয়ায় ঝাড়দাররা পর্যন্ত শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু নিবেদিতা বিদেশিনী হয়েও রামকৃষ্ণ সঙেঘর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে রোগীর সেবায় লেগে গিয়েছিলেন, এমনকি রাস্তায় নেমে নিজে হাতে ঝাড়ু নিয়ে রাস্তা পরিস্কারের কাজে নেমে পড়েছিলেন। তাঁকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় এই সেবা কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মঠের সন্ন্যাসীদের পুরোভাগে থেকে নিবেদিতা আর্তের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন।

নিবেদিতার করুণামাখা হাতের স্পর্শে দূর হোল প্লেগের আতঙ্ক। নিবেদিতার আসন প্রতিষ্ঠিত হোল দেশবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থলে।

স্কুল প্রতিষ্ঠার পর স্কুল চালানো খুব সহজ ছিল না। ছাত্রী এবং অর্থ জোগাড় করাটা বেশ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। নারীশিক্ষায় অনাগ্রহী সমাজ থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে একটি একটি করে ছাত্রী সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই স্কুল পরিচালনার জন্যে তিনি বিদেশ থেকেও অর্থ জোগাড় করেন। তার জন্য অবশ্য তাঁকে ১৮৯৯ সালে বিদেশে যেতে হয়। ধীরে ধীরে নিবেদিতার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করলেন স্বামীজি। মঠ-মিশনের কর্মসূচীর বাইরে ব্রাহ্মসমাজের সভাতেও তিনি যোগ দিতে লাগলেন। সপ্তাহে একদিন মহিলাদের সভায় বক্তৃতা দিতেন। এই সভায় উপস্থিত থাকতেন কেশব সেনের মেয়ে, ইন্দিরাদেবী (ঠাকুর-পরিবারের), সরলাদেবী, লাবণ্যপ্রভাদেবী প্রমুখ মহিলারা।

নিজের দেশে বৃটিশ শাসন-শোষণ ও অত্যাচারের সঙ্গে পরিচয় ছিল নিবেদিতার। ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। নিবেদিতা অনুভব করলেন মা কালীর সাধনার মধ্যেই রয়েছে বৈপ্লবিক চেতনা। ভারতীয় আধাত্মিক সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রচনা করলেন Kali the Mother, The Story of Kali, The Vision of Shiva, The Voice of Mother ইত্যাদি। নিবেদিতার Kali the Mother বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিখ্যাত 'ভারতমাতা' ছবিটি আঁকেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম। অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, তাঁর স্ত্রী অবলা বসু, যদুনাথ সরকার, নন্দলাল বসু, দিনেশচন্দ্র সেন, অসিত কুমার হালদার প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিত্বেরা ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'লোকমাতা' আখ্যা দেন।

এদিকে অবিশ্রান্ত কাজের চাপে স্বামী বিবেকানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি মহাসমাধি লাভ করলেন। একটা দুরন্ত ঝড়ে ভারত তথা সারা বিশ্বে নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে চলে গেলেন এই বীর সন্ন্যাসী। নিবেদিতার মন্ত্রগুরু, আদর্শ-পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে হারিয়ে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। সমস্ত কাজের নির্দেশ, উপদেশ যাঁর কাছ থেকে পেতেন, তিনি আজ অনুপস্থিত। আজ তাঁর কর্তব্য ও কর্মপন্থা কে নির্দেশ করবে? এখন থেকে তাঁর সাধনা হ'ল তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারতবর্ষকে পুনর্গঠন করা। ভগিনী নিবেদিতার নতুন কর্মক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত হোল ভারতীয় রাজনীতিতে।

উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রশ্নে ধীরে ধীরে মঠের সাথে সম্পর্ক শিথিল হয়ে এল। নিবেদিতার Kali the Mother পড়ে শ্রীঅরবিন্দ অনুপ্রাণিত হলেন এবং বাংলার মাটিতে প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। মুক্তিকামী যুবকদের সংগঠিত করে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে দেশব্যাপী গড়ে তুললেন বিপ্লবী আন্দোলন। প্রত্যাক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিবেদিতাও জড়িয়ে পড়লেন এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে। এই সময়ই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা স্থাপিত হয়। এবং তখনই, ব্রিটিশ সরকার যাতে রামকৃষ্ণ মিশনকে অযথা উত্যক্ত না করে, সেই কথা ভেবে মিশনের সঙ্গে তিনি তাঁর 'আনুষ্ঠানিক' সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তা সত্বেও মৃত্যুর ঠিক ৬ দিন আগে (৭ই অক্টোবর ১৯১১) তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি একটি উইলের মাধ্যমে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের নামে সমর্পন করে যান।

রাজনীতির কারনে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করলেও, আজীবন নিজের পরিচয় দিয়েছেন "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা" বলে। নিপীড়িত ও দরিদ্রের জাগরন ঘটাবার জন্যে স্বামীজির আহ্বানই তাঁকে রাজনীতির জগতে টেনে এনে ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোনও জাতির পক্ষে কিছুতেই আর্থিক ও মানসিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। তিনিই প্রথম বারাণসীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উদাত্তকন্ঠে আহ্বান জানান বিলেতী দ্রব্য বর্জনের। তাঁর স্বপ্ন ছিল অখন্ড সুখী বিবেক-পরিচালিত ভারতবর্ষ। তিনি বিশ্বাস করতেন এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশকেন্দ্র ভারতবর্ষ। তাই ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিই ছিল তাঁর চরম লক্ষ্য।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কোলকাতার টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় তাঁর বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীকে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলে। পরের বছর পূর্ব বাংলার বন্যা ও দুঃর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সেবা করতে গিয়ে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে উড়িষ্যায় যান দুঃর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার জন্যে। সেখানেও আক্রান্ত হন সেরিব্রাল ফিবারে।

১৯১০ সালে স্বামীজির জন্মদিনে প্রকাশিত হয় নিবেদিতার বিখ্যাত বই "The Master I saw Him"। এরই কয়েকদিন পরে, ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে চলে গেলে, নিবেদিতা অরবিন্দ পরিচালিত 'কর্মযোগিন' পত্রিকার ভার নিজ হাতে তুলে নেন। চন্দননগর থেকে পন্ডিচেরীতে চলে যেতে নিবেদিতাই শ্রীঅরবিন্দকে গোপনে সাহায্য করেন।

১৯০২ সাল থেকে ১৯১১ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক রক্তলিপ্ত অধ্যায়। উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষ। ইংরাজ শাসনকে উচ্ছেদের জন্যে প্রাণবলি দিতে লাগলেন বিপ্লবী তরুণের দল। কেঁপে উঠল বৃটিশ সিংহাসন। দমন-পীড়ন যত বাড়তে লাগল, পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল বিপ্লবীদের আক্রমণ ও আত্মদানের পালা। এই দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিবেদিতার শরীর ভেঙ্গে যায়। স্বাস্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি জগদীশ চন্দ্র বসুর পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিঙে যান। সেখানেই তিনি ৭ই অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশনের নামে তাঁর সমস্ত সম্পতির উইল করেন। এখানে তিনি অসুস্থ হয়েই এসেছিলেন। একদিন অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল। আক্রান্ত হলেন আমাশয়ে। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে, মাত্র ৪৪ বছর বয়সে, ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর তাঁর সাধনোচিত ধামে গমন করলেন।

ভারতের সেবায় নিবেদিত প্রাণ মার্গারেটের নাম স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন 'নিবেদিতা', রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন 'লোকমাতা' বলে, জগদীশচন্দ্র নাম দিয়েছিলেন 'শিখাময়ী'। কিন্তু ভারতবাসীর প্রাণে তিনি বিবেকানন্দের নিবেদিতা– 'সিস্টার নিবেদিতা', 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা', হয়েই বিরাজ করবেন চিরকাল।

Sister Nivedita, Mrs. Sevier, Sister Christine and Smt. Abala Basu

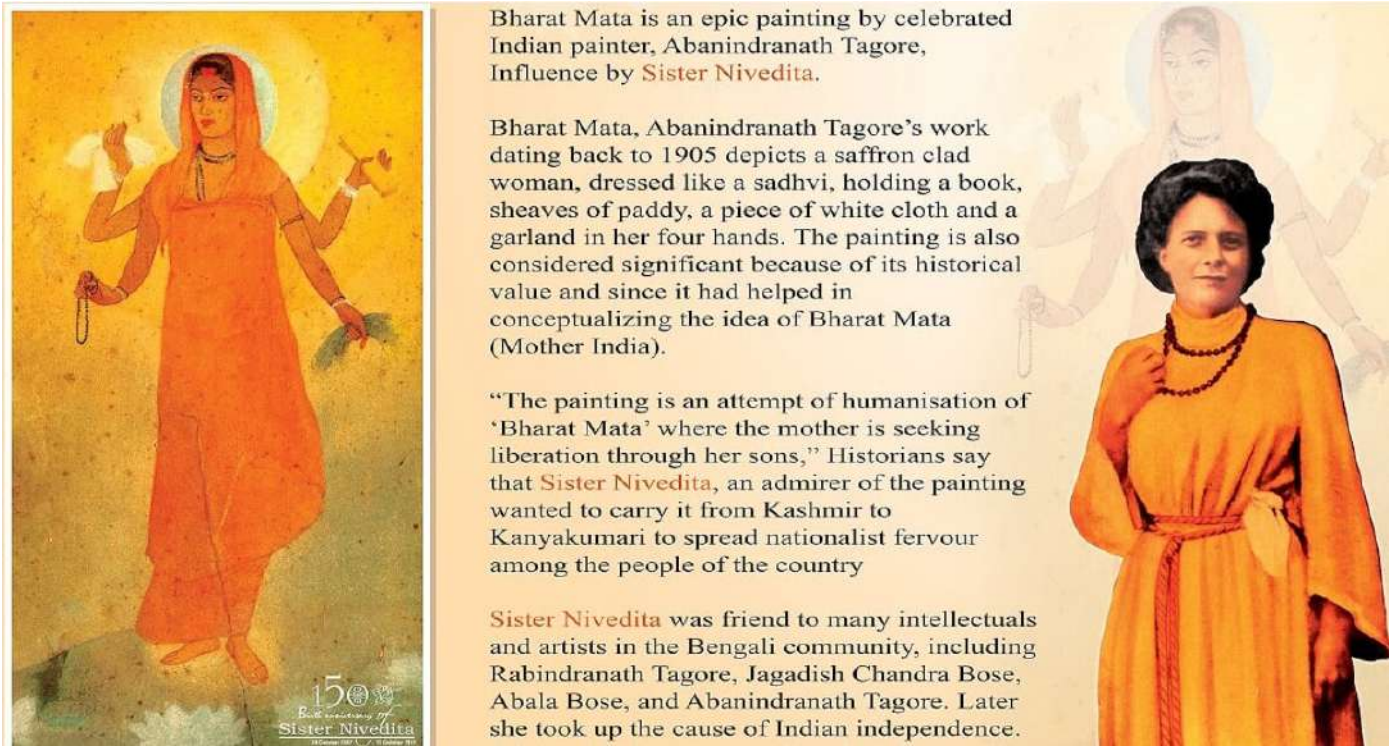

Bharat Mata is an epic painting by celebrated Indian painter, Abanindranath Tagore, Influence by Sister Nivedita.

Bharat Mata, Abanindranath Tagore's work dating back to 1905 depicts a saffron clad woman, dressed like a sadhvi, holding a book, sheaves of paddy, a piece of white cloth and a garland in her four hands. The painting is also considered significant because of its historical value and since it had helped in conceptualizing the idea of Bharat Mata (Mother India).

"The painting is an attempt of humanisation of 'Bharat Mata' where the mother is seeking liberation through her sons," Historians say that Sister Nivedita, an admirer of the painting wanted to carry it from Kashmir to Kanyakumari to spread nationalist fervour among the people of the country

Sister Nivedita was friend to many intellectuals and artists in the Bengali community, including Rabindranath Tagore, Jagadish Chandra Bose, Abala Bose, and Abanindranath Tagore. Later she took up the cause of Indian independence.

নীল তিমি, লাল মাছ ॥

ঃ রঞ্জন প্রসাদ ॥

সারি সারি উঁচু বাড়ি খোঁচা মারে মেঘমুলুকে
তার ভিতরে থাকে যারা, ভাবছো আছে দিব্যি সুখে
একটা গল্প বলছি তবে
শুনলে তুমি অবাক হবে
সেই বাড়িতে একটা ছেলে ঘুরে বেড়ায় শুকনো মুখে

মা গিয়েছে ফ্যাশান শো'তে, বাবা ক্লাবে - ফিরবে রাতে
ঠাম্মি-দাদু, কাকু-কাকী নেই হিসেবে তার খাতাতে
সব কিছু সাজানো ঘরে
তবুও মন খারাপ করে
সব পাওয়া সেই দু:খী ছেলে ভাব করে নীল তিমির সাথে....

ক্রসিং'এ যেই দাঁড়ায় গাড়ি - একটি ছেলে বেচে বাদাম
শীর্ণ দেহ, জীর্ণ জামা, কে খোঁজ রাখে তার যে কী নাম
তবুও তার কাজের ফাঁকে
মনটা জানি কোথায় থাকে
কাচ ঘেরা লাল মাছের দোকান; হয় না কেনা, জোটে না দাম....

এক বয়েসী দুটো ছেলে জন্মেছে এক স্বাধীন দেশে
ঠিক একটা তো? সত্যি স্বাধীন? এ প্রশ্নটাই উঠছে ভেসে
বলতে পারো কেউ কি তবে
আরও ক'জন এ খেলাবে
কোন বাড়িতে, কোন ক্রসিং'এ হারিয়ে যাবে দিনের শেষে....

রঞ্জন প্রসাদ ॥

২ অক্টোবর, ২০১৭
রিজেন্ট পার্ক
কলকাতা - ৭০০ ০৪০।
চলভাষ: ৯৮৩১১-৬৭৭৯৭ ॥

☆ এই কবিতাটি একটি রক সংগীতে রূপান্তরিত করে পরিবেশিত ২৪শে অক্টোবর'১৭/প্রেসিডেন্সী কলেজে শিল্পীর স্বকণ্ঠে ॥

পাণ্ডবজায়া দ্রৌপদী

অভিজিৎ দাস

দ্রোণাচার্যর সঙ্গে ঋষি ভরদ্বাজের (দ্রোণের পিতা) বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় পাঞ্চালরাজ পৃষতের পুত্র দ্রুপদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। দ্রোণকে তিনি কথা দেন রাজা হওয়ার পর তাঁর রাজ্যে দ্রোণেরও সমান অধিকার থাকবে। পিতার মৃত্যুর পর পাঞ্চালের রাজা হয়ে কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা দ্রুপদ ভুলে গেলেন এবং বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে এসে দ্রোণ তাঁর কাছে অত্যন্ত অপমানিত হলেন। তিনি দ্রোণকে বললেন, "হতে পারে গুরুগৃহে অধ্যয়ন করার সময় তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব কখনো চিরস্থায়ী হয় না। ধনীর সঙ্গে নির্ধনের কখনো বন্ধুত্ব হয় না। আজ আমি রাজা আর তুমি দীনহীন ব্রাহ্মণ। কোন্ মুখে আমার কাছে তুমি বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে এসেছ?" এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে দ্রোণাচার্য অবিলম্বে হস্তিনাপুরে এসে রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছাত্রদের কাছে গুরুদক্ষিণা হিসাবে দ্রোণ দাবি করলেন 'পাঞ্চালবিজয়'। প্রধানতঃ অর্জুনের জন্যই সেই কাজ সুসম্পন্ন হল। রুধিরাক্ত দ্রুপদকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দ্রোণের কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্য অধিগ্রহণ করে নিলেন। দ্রোণ-অধিকৃত পাঞ্চালের এই উত্তরাংশের রাজধানী হল অহিচ্ছত্র নগরী।

রাজা হওয়া দ্রোণের উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ সমগ্র মহাভারতের কোথাও তাঁকে অহিচ্ছত্রে পদার্পণ করতে দেখা যায় না। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল একজন 'দীনহীন ব্রাহ্মণে'র ক্ষমতা রাজগর্বে গর্বিত দ্রুপদকে বোঝানো। কালক্রমে তাই উত্তর পাঞ্চাল কুরুরাজ্যের অন্তর্গতই হয়ে যায়।

এই ঘটনায় দ্রুপদের যে চরম অবমাননাই শুধু হল তাই নয়, তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানও দুর্বল হয়ে গেল। সেটা হজম করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। প্রতিশোধস্পৃহায় দ্রুপদ একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলেন। তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল দ্রোণবধ। তবে কুরুদের প্রতি-আক্রমণ করার বাসনা তিনি ত্যাগ করলেন যেহেতু সেই পক্ষে অর্জুন আছেন। তিনি ঠিক করলেন এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে সাপও মরে অথচ লাঠি না ভাঙে। অর্থাৎ দ্রোণবধও হয় আবার অর্জুনও তাঁর পক্ষে থাকেন। উপযাজ নামক এক ব্রাহ্মণের কাছে দ্রুপদ তাঁর মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন এর জন্য একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে হবে কিন্তু তার পৌরোহিত্য তিনি করবেন না। তবে তাঁর দাদা যাজকে যদি প্রচুর গোধন ইত্যাদি দান করা হয় তাহলে তিনি সেই যজ্ঞ করতে সম্মত হবেন, কারণ তিনি লোভী এবং পবিত্র-অপবিত্র তোয়াক্কা করেন না। দ্রুপদের অনুরোধে যাজ সম্মত হয়ে সেই যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে প্রথমে নির্গত হলেন তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ও সশস্ত্র এক মহাবীর ও তার অব্যবহিত পরেই শ্যামাঙ্গী পরমাসুন্দরী এক কন্যা।

ধৃষ্ট (প্রগল্‌ভ) ও দ্যুম্ন (দ্যুতি, বীর্য, যশ, ধন)-সমন্বিত – এই কারণে পুত্রটির নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যজ্ঞসম্ভূতা বলে কন্যাটির নাম যাজ্ঞসেনী (দ্রুপদের আর এক নাম যজ্ঞসেন) হল। যাজ বলে গেলেন ধৃষ্টদ্যুম্নর হাতেই দ্রোণের মৃত্যু হবে। কন্যাটির আরো তিনটি নাম পরবর্তীকালে আমরা পাই। গাত্রবর্ণ অনুসারে তাঁর প্রথম নাম কৃষ্ণা, পিতা দ্রুপদের নামানুসারে তাঁর দ্বিতীয় নাম দ্রৌপদী (যেটি সর্বাধিক প্রচলিত) আর পাঞ্চাল-রাজকন্যা হিসেবে তাঁর তৃতীয় নাম হয় পাঞ্চালী। বালিকা বয়স থেকেই রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে দ্রৌপদী হয়ে ওঠেন প্রচণ্ড অহঙ্কারী। তাঁকে নিয়েই দ্রুপদের পরবর্তী পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। তিনি ঠিক করলেন দ্রৌপদীর মাধ্যমেই অর্জুনের সঙ্গে তিনি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হবেন – জামাতা করবেন তাঁকে।

দ্রৌপদীর যৌবন উপস্থিত হলে দ্রুপদ ঠিক করলেন তিনি স্বয়ম্বরা হবেন। এদিকে সেই সময় পাণ্ডবরা পলাতক। এমনকি সকলেই জানে তাঁরা মৃত। কিন্তু গুপ্তচরের মাধ্যমে দ্রুপদ জেনেছিলেন জতুগৃহ থেকে তাঁদের পলায়নের কথা।

নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য স্বয়ম্বরসভায় একটি লক্ষ্যভেদের আয়োজন করলেন দ্রুপদ। উর্ধে একটি ঘুরন্ত চাকা, তার ওপারে এক কৃত্রিম মাছ এবং এগুলির ছায়া পড়বে নীচে রাখা একটি পাত্রের জলে। সেই ছায়া বা প্রতিবিম্ব দেখে যে ধনুর্ধর মাছের চোখ বিদ্ধ করতে পারবে, তারই গলায় দ্রৌপদী বরমাল্য দেবেন। ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রুপদ বললেন, "ভূভারতে অর্জুন ছাড়া এ কাজ আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয়"।

নির্দিষ্ট দিনে স্বয়ম্বর অনুষ্ঠিত হল। স্বয়ম্বরের শর্ত ঘোষিত হল। জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভীষ্মক, ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, দুর্যোধন প্রমুখ বীরগণ ব্যর্থ হলে কর্ণ এলেন লক্ষ্যভেদ করতে। অন্যরা সভায় রক্ষিত যে বিরাট ধনুটি তুলতেই সক্ষম হননি, কর্ণ সেটি অনায়াসেই তুলে তাতে গুণ পরিয়ে ফেললেন। তারপর যখন তিনি লক্ষ্যভেদ করার জন্য শরনিক্ষেপ করতে যাবেন ঠিক তখনই দ্রৌপদী করে বসলেন এক চরম অন্যায়। স্বয়ম্বরের শর্ত লঙ্ঘন করে তিনি বলে বসলেন, "সূতপুত্রকে আমি বিবাহ করব না"। কর্ণ তখন অঙ্গরাজ। শর্তভঙ্গ করে তাঁর মত বীরকে সর্বসমক্ষে এভাবে অপমান করার অধিকার দ্রৌপদীর ছিল না। সক্রোধে হাস্য করে অপমানিত কর্ণ তৎক্ষণাৎ ধনুর্বাণ ত্যাগ করে চলে গেলেন। কর্ণের পরবর্তী রাজন্যবর্গও অসফল হবার পর এলেন ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন। ছদ্মবেশে থাকা সত্ত্বেও প্রবল বুদ্ধিমতী দ্রৌপদীর তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না। অনায়াস ভঙ্গীতে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করার পরেই সহচরীর হাত থেকে বরমাল্য নিয়ে দ্রৌপদী তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পরই সভায় মহাকোলাহল শুরু হল। রাজারাজড়ারা বলতে লাগলেন স্বয়ম্বরে অংশগ্রহণ করার অধিকার কেবল ক্ষত্রিয়দের। ব্রাহ্মণদের সেই অধিকার দিয়ে দ্রুপদ প্রকারান্তরে তাঁদের অপমান করেছেন। ওদিকে ব্রাহ্মণরাও দণ্ড-কমণ্ডলু নাড়িয়ে চিৎকার করে অর্জুনকে তাঁদের সমর্থন জানাতে লাগলেন। হঠাৎ দেখা গেল বিশালদেহী ব্রাহ্মণবেশধারী এক যুবক একটি শালতরু উৎপাটিত করে সেটি হাতে নিয়ে অর্জুনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ওদিক থেকে দ্রুপদ তাঁর ভ্রাতা সত্যজিৎ ও তিন পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা ও শিখণ্ডীকে নিয়ে রণবেশে অর্জুনের কাছে এসে দণ্ডায়মান হলেন। অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ শুরু হতেই কৃষ্ণ ও বলরাম এসে সেই লড়াই থামিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ বললেন, "উপস্থিত রাজন্যমণ্ডলী, এই বিবাহে আপত্তি করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই। আপনারা যা পারেননি, এই ব্রাহ্মণ যুবক তা পেরেছেন এবং স্বয়ম্বরের শর্ত অনুসারেই দ্রৌপদী তাঁকে বরমাল্য প্রদান করেছেন (কর্ণের বেলায় এই শর্তের কথাটা অবশ্য কৃষ্ণর মনে পড়েনি)। সুতরাং যুদ্ধ করে নিজেদের আর হাস্যাস্পদ করে তুলবেন না। তাছাড়া দেখতেই পাচ্ছেন এই যুবক কিন্তু মোটেই নিঃসহায় নন"। তাঁর যুক্তি শুনে রাজারা ক্ষান্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

এর পর বিবাহের অন্যান্য আচার ও রীতি পালন করে দ্রৌপদী পতিগৃহে যাত্রা করলেন। ধনুর্বাণ নিয়ে অর্জুন ও শালতরু-হস্তে ভীমের সঙ্গে যোগ দিলেন ব্রাহ্মণবেশী যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব। বহু পথ অতিক্রম করে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন নগর-প্রান্তের একটি কুটিরে। দ্বার বন্ধ দেখে যুধিষ্ঠির ডেকে বললেন, "মা, দ্বার খোলো, দ্যাখো আজ কী ভিক্ষা পেয়েছি"। দ্বার না খুলেই ভিতর থেকে অন্যান্য দিনের মতই কুন্তী বললেন, "যা এনেছ ভাগ করে নাও"। চমকিত হলেন দ্রৌপদী। তিনি কি পাঁচজনের মধ্যে বিভাজনীয় একটি ভিক্ষালব্ধ ধন? অর্জুনকেই তো তিনি স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কুন্তী দরজা খুলে দ্রৌপদীকে দেখে তো অবাক। পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে তিনি যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে বললেন, "হায়, এ আমি কি করলাম না দেখে! এ যে উর্বশীর মতো রূপসী এক কন্যা! স্ত্রী কখনো ভাগ হয়? তুমি এরকম রহস্য কেন করলে, যুধিষ্ঠির?" এদিকে মাতৃআজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। তাই পাণ্ডবরা ভাবতে বসলেন কি করা যায়।

ঠিক এইসময় পাণ্ডবদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে দাদা বলরামের সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন মুসকিল-আসান শ্রীকৃষ্ণ। সব শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তিনি বললেন, "পূর্বজন্মে দ্রৌপদী তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছে বর চেয়েছিলেন যে এই জন্মে যেন তিনি ধর্মের প্রতীক, পবননন্দন হনুমানের মত শক্তিধর, পরশুরামের মত ধনুর্ধর, অসামান্য রূপবান ও পর্বতের মত সহনশীল এক স্বামী লাভ করেন। মহাদেব বলেছিলেন এতগুলি গুণ একটি পুরুষের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। অতএব পরজন্মে

তোমার পাঁচজন স্বামী হবে। পঞ্চপাণ্ডব একত্রিতভাবে এই গুণগুলির অধিকারী। যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধর্মরাজের পুত্র, ভীম পবনপুত্র এবং এই যুগের সবচেয়ে বলবান পুরুষ, অর্জুনের সমান ধনুর্ধর এযুগে আর নেই, নকুল একালের সুন্দরতম পুরুষ আর সহনশীলতার সহদেবের সমান আর কেউ নেই"।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বয়স অনুসারে পাণ্ডবদের সঙ্গে পর-পর দ্রৌপদীর বিবাহ হয়ে গেল আনুষ্ঠানিক ভাবে। তবে দ্রৌপদী তাঁর প্রকৃত স্বামী মনে করতেন অর্জুনকেই। অন্যদের তিনি ভাসুর বা দেবর হিসেবেই দেখতেন। আবার পাণ্ডবদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন ভীম। তাই তাঁর কাছেই ছিল দ্রৌপদীর যত আবদার।

যথাসময়ে হস্তিনাপুরে খবর এল যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভার সেই ব্রাহ্মণ ধনুর্ধর আর কেউ নন, স্বয়ং অর্জুন এবং শালগাছ হাতে নিয়ে যে ব্রাহ্মণবেশী যুবক অর্জুনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি ভীম। অন্য তিন পাণ্ডবও ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সেই সভাতেই ছিলেন। তারপর কিভাবে ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে অর্ধেক রাজত্ব হিসেবে পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থ পেলেন, কৃষ্ণর অনুরোধে বিশ্বকর্মা কেমন করে অপূর্ব এক নগর সেখানে প্রস্তুত করে জায়গাটিকে ইন্দ্রপ্রস্থে রূপান্তরিত করলেন, কিভাবেই বা খাণ্ডবদাহনের সময় কৃষ্ণার্জুনের কৃপায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ময়দানব পাণ্ডবদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে অপূর্ব এক সভাগৃহ নির্মাণ করলেন – সেই সব বিশদ বিবরণে আর গেলাম না। তবে এটা বলে রাখা ভাল যে ময়দানব-নির্মিত সভাগৃহটিকে 'মায়াপুরী'-ও বলা চলে যেখানে স্থলকে দেখে লোকে ভাববে জল, আবার জল দেখে মনে করবে স্থল। যাই হোক, এরকম অভূতপূর্ব এক সভাভবন পেয়ে যুধিষ্ঠিরের বড় সাধ হল রাজসূয় যজ্ঞ করার। রাজসূয় যজ্ঞের হোতা রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বা রাজচক্রবর্তী ঘোষণা করা হয়। যে সব রাজা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মানেন না, তাঁদের সঙ্গে সেই যজ্ঞের হোতার যুদ্ধ হয় যে যুদ্ধে যজ্ঞের হোতাকে বিজয়ী হতে হয়। যাঁরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবেন, তাঁদের প্রচুর উপঢৌকন দিতে হয়। এই যজ্ঞের প্রধান বাধা প্রবলপরাক্রমী মগধপতি জরাসন্ধকে তাই প্রথমেই অসতর্ক ও কোনো ব্রত উদযাপনের জন্য উপবাসী অবস্থায় কৌশলে হত্যা করা হল। বাকি কাজটা সহজ হয়ে গেল কেননা বাকী রাজারা যুধিষ্ঠিরের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে প্রচুর উপঢৌকন দিতে বাধ্য হলেন। ছেলেবেলা থেকেই ভীমের হাতে দিনের পর দিন নিগৃহীত হতে হতে পাণ্ডবদের সকলের প্রতি দুর্যোধনের মনে প্রচণ্ড এক বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। অন্য চার ভাইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণার কারণ হল, যখন ভীম ধার্তরাষ্ট্রদের উৎপীড়ন করতেন তখন তাঁরা দন্ত বিকশিত করে তা উপভোগ করতেন। এহেন দুর্যোধনের বিতৃষ্ণা আরো বাড়ানোর জন্যই কি যুধিষ্ঠির তাঁর ওপর ভার দিয়েছিলেন উপরোক্ত রাজাদের উপঢৌকন গ্রহণ ও তার হিসেব রাখার? তিনি তো এই দায়িত্বভার অনায়াসেই নকুল বা সহদেবের ওপর ন্যস্ত করতে পারতেন, যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা সারা মহাভারতে পাওয়া যায় না। মনে হয় পাণ্ডবদের সংখ্যাটা পাঁচ করার জন্যই যেন ব্যাসদেব চরিত্র দুটির সৃষ্টি করেছেন।

ফল যা হবার তাই হল – দুর্যোধনের বিতৃষ্ণা পর্যবসিত হল ঘৃণা ও ঈর্ষায়। এছাড়াও আর একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটল। মায়াপুরীতে অন্যদের মত দুর্যোধনও যখন জলকে স্থল ও স্থলকে জল ভেবে অপদস্থ হচ্ছিলেন তখন ভীম ও অর্জুন হাসাহাসি করলেন। দ্রৌপদী আবার আর একটু বেশি এগিয়ে দাসীদের গায়ে হাসতে হাসতে ঢলে পড়ে মন্তব্য করলেন, 'অন্ধের ব্যাটা অন্ধ'। আর যায় কোথায়, প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ও অবমানিত দুর্যোধন সেই মুহূর্তে ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করলেন। বিনা কারণে ও প্ররোচনায় দুর্যোধনকে দাসদাসীদের সামনে এইভাবে অপমান করার অধিকার দ্রৌপদীকে কে দিয়েছিল! তাঁর কথায় যে শুধু দুর্যোধনই অপমানিত হয়েছিলেন তাই নয়, অবমাননা হয়েছিল দুর্যোধনের পিতা ও দ্রৌপদীর জাঠশ্বশুর ধৃতরাষ্ট্রেরও। দ্রৌপদী এটাও ভুলে গেলেন সেই সময় দুর্যোধনের রাজনৈতিক পদমর্যাদা তাঁর স্বামীদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, বরং আর একটু বেশি, কারণ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলে তাঁর বকলমে হস্তিনাপুরের শাসনভার ছিল দুর্যোধনের উপর। হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থের ঘটনা ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন। তাঁরাও বেশ বিরক্ত হলেন। দ্রোণ মৃদু হেসে বললেন, "বাপের উপযুক্ত মেয়েই হয়েছে বটে"।

দুর্যোধনের হঠাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যুধিষ্ঠির পুরো ব্যাপারটা জানতে পেরে দ্রৌপদীকে তিরস্কার করে বললেন, "পাঞ্চালী, তুমি এটা কি করলে? সুযোধনকে তুমি এমন অপমান করলে, যে সে ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল? সে আমাদের অতিথি হয়ে এখানে এসেছিল। তুমি কি পাঞ্চালরাজের কাছ থেকে অতিথিকে অপমান করার শিক্ষাই পেয়েছ?" (দ্রোণাচার্যকে দ্রুপদের অপমান করার ঘটনারই উল্লেখ বোধহয় যুধিষ্ঠির করেছিলেন) প্রত্যুত্তরে চিরকালের প্রতিবাদিনী দ্রৌপদী বললেন, "বৌদি হিসেবে দেবরের সঙ্গে একটু রসিকতাই করেছিলাম। জানতাম না সেই অধিকার আমার নেই। তুমি যা যা বললে আর্যপুত্র, অত সব ভেবে কথাটা আমি বলিনি"।

"তুমি সত্যের অপলাপ করছ। যদি নির্মল রসিকতাই তোমার উদ্দেশ্য হত, তাহলে দাসীদের সামনে তুমি তাকে বিদ্রূপের কশাঘাতে বিদ্ধ করে 'অন্ধের ব্যাটা অন্ধ' বলতে না। এবং কথাটা বলে তুমি আমাদের জ্যাঠামশাইকেও অপমান করেছ, যা তোমার সম্পূর্ণ অধিকার-বহির্ভূত"।

এবার দ্রৌপদী নত মুখে বললেন, "পরে আমারও মনে হয়েছে কাজটা আমি ঠিক করিনি। এর জন্য তুমি আমায় শাস্তি দাও"।

"তোমায় শাস্তি দিয়ে লাভ নেই। সুযোধন অত্যন্ত অভিমানী এবং বিনা কারণে তাকে কেউ অপমান করলে সে তা ভোলে না। তোমার এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত মনে হয় আমাদেরই করতে হবে"।

সেটা করতে হয়েছিল এবং করতে হয়েছিল সুদে আসলে। অবশ্য তার জন্য নেশাড়ু যুধিষ্ঠিরের নির্বুদ্ধিতাও বহুলাংশে দায়ী। ইন্দ্রপ্রস্থের ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমরা দেখি কুখ্যাত সেই দ্যূতক্রীড়ার অধ্যায়, যেখানে ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অক্ষবিদ শকুনির কাছে যুধিষ্ঠিরকে গো-হারা হারতে হয়েছিল। একের পর এক পণ হারতে হারতে নেশাগ্রস্ত যুধিষ্ঠির শেষে দ্রৌপদীকে পণ রেখে বসলেন। বলা বাহুল্য সেই বাজিও তিনি হারলেন।

সেই সময় দ্রৌপদী রজস্বলা ও একবস্ত্রা ছিলেন। দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন যখন তাঁকে রাজসভায় আনতে গেলেন তখন দ্রৌপদী তাঁকে সেকথা জানিয়েও দেন। কিন্তু তাঁর কোনো কথা না শুনে দুঃশাসন ওই অবস্থাতেই কেশাকর্ষণ করে তাঁকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। তারপর কর্ণর নির্দেশে তিনি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টাও করেন। দুর্যোধনও বসন সরিয়ে বাম ঊরুতে দ্রৌপদীকে বসতে আহ্বান করেন। এই অপমানের প্রতিকারের জন্য দ্রৌপদী ভীষ্মের কাছে গেলে তিনি বলেন, "এর জন্য তুমি অনেকাংশেই দায়ী। স্বয়ম্বর সভায় কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করে তুমি সত্যধর্ম পালন করো নি। শুধু প্রত্যাখ্যানই নয়, বিনাকারণে সর্বসমক্ষে তাকে 'সূতপুত্র' বলে অপমান করতেও তুমি কুন্ঠিত হও নি। ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের বিড়ম্বনা দেখে তাকে তোমার দাসীদের সামনে তুমি 'অন্ধের ব্যাটা অন্ধ' বলে বিদ্রূপই বা কেন করেছিলে? এতে যে শুধু দুর্যোধনকেই নয়, তোমার জাঠশ্বশুরকেও অপমান করা হয় সেটা একবারও তোমার মনে হয়নি? দুর্যোধন বা ধৃতরাষ্ট্র তোমার কোন্ ক্ষতি করেছিল? এই সবের জন্য তোমার প্রতি ঘৃণা ও প্রতিহিংসার যে আগ্নেয়গিরি তৈরি হয়েছিল, এই সভায় তারই বিস্ফোরণ আজ ঘটল। তাছাড়া যুধিষ্ঠির কেন তোমায় পণ রাখল, এই প্রশ্ন তুমি তাকে কেন করছ না? তোমার দুরবস্থার জন্য তো সে-ই দায়ী। কাজেই এ অবস্থায় নীরব থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় আমার নেই"।

অবশেষে কৃষ্ণর কৃপায় সেদিন দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ হয়েছিল – বেঁচেছিলেন তিনি চরম অপমানের হাত থেকে। দ্রৌপদী যাই করে থাকুন না কেন, তাঁর প্রতি এই তীব্র লাঞ্ছনা কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। দুর্যোধনের মনে রাখা উচিত ছিল, যতই হোক দ্রৌপদী কুরুবংশেরই কুলবধূ। সর্বসমক্ষে তাঁর বস্ত্রহরণের প্রচেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ এবং এতে নিজেদের বংশেরই অপযশ হয়। এর শাস্তি দুর্যোধন ও দুঃশাসন পেয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হাতে। সেটা অবশ্য অন্যায় যুদ্ধে, কিন্তু এটা সেই আলোচনার ক্ষেত্র নয়। অন্যত্র সেটা করা যাবে।

দ্রৌপদীর প্রতি এই প্রগাঢ় ভালবাসার প্রতিদান কিন্তু ভীম পাননি। তাঁর প্রতি কোনো প্রেম বা ভালবাসা দ্রৌপদীর ছিল না। তাঁর সমস্ত ভালবাসা ছিল অর্জুনের প্রতি, যিনি সারাজীবন তাঁকে প্রবঞ্চনাই করে গেছেন।

উদাহরণ হচ্ছেন সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, উলুপীপুত্র ইরাবান ও চিত্রাঙ্গদা-তনয় বভ্রুবাহন, অর্জুনের ঔরসেই যাঁদের জন্ম। মহাপ্রস্থানের পথে তাই প্রথমেই যখন দ্রৌপদীর পতন হল, তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বলেন, ‘‘আমরা পাঁচজন দ্রৌপদীর স্বামী ছিলাম কিন্তু তিনি কেবল অর্জুনকেই ভালবাসতেন। একমাত্র কার্যোদ্ধারের সময় তিনি তোমার শরণাপন্ন হতেন। এই অন্যায়ের প্রতিফলই তিনি পেলেন’’।

আবার ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা

দীপক ভট্টাচার্য

প্রবীর গুপ্তর দায়-দায়িত্ব প্রত্যেক মাসে আমাদের web-magazine বার করা। প্রায়ই লেখার সংখ্যায় টান পড়ে। তখন এই অধমের কাছে অনুরোধ আসে লেখা দেওয়ার জন্য। এ মাসেও এসেছে। তড়িঘড়ি করে প্রামান্য রচনা নতুন করে লেখা আমার সাধ্যাতিত। কাজেই আবার ডায়েরীর ছেড়া পাতা। বন্ধরা ক্ষমা করে দিও।

++

20-10-17

কিছুদিন আগে দার্জিলিং জেলায় এক পুলিশ অফিসার (অমিতাভ মালিক) খুন হয়ে যাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, উনি অফিসারকে চিনতেন। আমার মনে পড়ল, বছর চারেক আগেকার আমার ডায়েরীর এক অন্তর্ভুক্তি। নীচে দিলাম সেটা।

(14-2-2013)

মমতা ব্যানার্জী খুন হয়ে যাওয়া পুলিশ-কর্মী তাপস চৌধুরীর বাড়ী গিয়ে দাত্রী অন্নপূর্ণার মত ঐ পরিবারকে নানান ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেড়িয়ে আসার পর সাংবাদিকদের বলেন যে তিনি মৃত পুলিশ কর্মীকে অনেকদিন আগে থেকে চিনতেন। চিনতেন কি চিনতেন না – সেটা তাপস চৌধুরী বলতে পারেন। তিনি তো মৃত। মৃতের স্ত্রীর কথা শুনে মনে হোলোনা উনি মমতাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিনতেন। তাহলে কি শুধু পুলিশ কর্মীকেই চিনতেন, অফিস সংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে? যদি তাই হয় তবে কর্মী মারা যাওয়ার পর পরই বলেননি কেন? তাহলে কি উদ্দেশ্য জনসাধারণের সহানুভূতি? যাই হোক, বুদ্ধিমতী মহিলা।))))

++

25-04-2015

কুড়ি তারিখ বন্ধের দিন কাজ করতে না আসা ডোমকলের হজরত ওমর সাহেবের উচিৎ - যারা তাঁর কান কেটে দিয়েছে তাদের ধন্যবাদ জানানো এই জন্য যে নাকটা কেটে নেওয়া হয়নি। যদিও বয়স্ক ওমর সাহেবের চুলের পরিমান কমে গেছে, তবু একটা সম্ভাবনা আছে যে চুল বাড়িয়ে চুল দিয়ে কাটা কানটা ঢাকা দেওয়া যাবে। নাহলে টুপি তো আছেই। নাকটা কাটা গেলে কি করে ঢাকতেন? কথায় বলে – 'আপনার মন আপনি রাখি, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি'। কথায় এটাও বলে –'বেহায়ার হায়া নাস্তি, নাক কেটে কড়া শাস্তি'। তাই বুদ্ধিমান লক্ষণ শূর্পনখার কান না কেটে নাক কেটে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদেরই হরিহর পাড়ার প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উচিৎ তাদেরকে ধন্যবাদ জাননো – যারা তাকে রোদ্দুরে কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রেখেছিল। কে না জানে, রোদ্দুর থেকেই ভিটামিন ডি তৈরি হয়। আর যাঁরা চড়, চাপড়, কিল ঘুষি ইত্যাদি খেয়েছেন? তেনারাও ধন্যবাদ জানালে পারেন। মার খেলে শরীরের দলাই-মলাই হয়।

++++++++++++++++++++++++++++++

24-07-17

রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে ইংল্যান্ডে দুজন “Nonsense” লেখক ছিলেন। Lewis Carroll (আসল নাম – Charles Lutwidge Dodgson) আর Edward Lear। আমি দুজনেরই পরম ভক্ত। কাজেই যখন, Guardian on-line edition-এ Edward Lear-এর ওপর একটা রচনা দেখলাম, তখন ওটা পড়েই ফেললাম। (**Mr Lear: a life of art and nonsense review – honey and heartbreak)**

উদ্‌ধৃতি

Biography of Edward Lear reveals a tortured unfulfilled soul for whom nonsense was a necessity.

If ever there was an English national literary treasure, he must be Edward Lear. In polls, including a recent one for National Poetry Day, The Owl and the Pussycat is often voted our favourite poem.

……..Thus, 1846 also saw the publication of *A Book of Nonsense* (now an exceedingly rare book). Uglow is good on Lear’s nonsense, attributing just the right amount of consequence to its surreal caprice:

There was an Old Person of Rhodes,
Who strongly objected to toads;
He paid several cousins,
To catch them by dozens,
That futile Old Person of Rhodes.

…In middle age, Lear’s wordplay had become quasi-Joycean, writes Uglow, “alive, protean, ever evolving, and finding new endings, like new limbs”. This is the Lear beloved of Auden and Eliot. He was, says Uglow, “an eerie, queery, sometimes weary, sometimes cheery Edward Lear”.

When “cheery”, he enjoyed moments that were **“splendidophoropherostiphongious**”, but there was always a terrible sadness, too, that only nonsense could assuage.

++

14-09-17

অন্য জাতির নাম ধরে গালাগাল দেওয়াটা অনেক ভাষাতেই বিদ্যমান। কুমিল্লা অঞ্চলে ‘মগা’ বলে গালাগাল দেওয়াটা রেওয়াজ ছিল। আমার মামাবাড়ী কুমিল্লা হওয়ার দৌলতে, আমি কথাটা ছোটবেলায় জানতাম। তবে ছ বছর বয়সে হাওড়া চলে আসার জন্য, ঐ শব্দের ব্যবহার করা হয়ে ওঠেনি। শুনতেও পাইনি আর। তবে ‘মগের মুল্লুক’ কথাটা তো সর্বজনবিদিত।

(‘‘মগের মুল্লুক আর কি! ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে’ – নীলদর্পণ/ ‘মগের মুল্লুক কিনা!’ – শরৎচন্দ্রের ষোড়শী)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mog_people

*The **Mog** are the Arakanese descendants who live in the Indian state of Tripura since the Arakan kingdom's control over Tripura in the 16th centuries. Arakanese descendants living in present-day Bangladesh are known as Magh or Marma people.*

এখনো কি ত্রিপুরায় 'মগাটা' বলে গালাগাল দেওয়াটা চালু আছে? কান্তি বনিককে জিজ্ঞাসা করতে হবে

আর একটা শব্দ 'উজবুক'। চলন্তিকা বলছে শব্দটার অর্থ মূর্খ/আহাম্মক। শব্দটার উৎস সম্বন্ধে চলন্তিকা কিছু লেখেনি। ফারসী শব্দ বলে মনে হয়। যদি তাই হয়, তবে কি ধরে নিতে পারি যে পারশীরা উজবেকদের নীচু চোখে দেখত?

কথাগুলো মনে পড়ল, একট। article পড়ে।

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/13/canada-chess-anton-kovalyov-shorts

Canada's chess federation is preparing to lodge a formal complaint with the sport's world governing body after the country's top prospect was berated for wearing shorts and called a "gypsy" by an official at a recent World Cup.

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/10/world-cup-chess-engulfed-race-row/

Grandmaster was told he couldn't wear shorts at chess World Cup because he 'looked like a gypsy'

(এই ঘটনা অন্তরালে ফেলে দিয়েছে, কানাডার ঐ GM-এর, আগের দিনই বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে দেওয়ার মত চমক লাগানো ঘটনাকে)

NML-এ থাকাকালীন, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে আসা এক 'বিজ্ঞানীর' সঙ্গে আলোচনার সময়, কি কারণে জানিনা, জিপসি (রোমানি) প্রসঙ্গ উঠেছিল। আগত বিজ্ঞানী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। এত ঘৃণা।

++

22-09-17

Why I did not read O Henry'a short stories earlier, though I bought a "Russian" book in 2011? So much fun, satire, humor and deep?

Anyway – two words from his short story 'The Pimienta Pancakes" are worth mentioning: – **'Jooka-lorum'** and '**zizzaparool'** Seems, these words were the inventions of Henry – but not used by others.

++

25-09-17

আজকের Guardian RUFUS crossword

It sounds highly unnatural (8). সমাধান: FALSETTO

সন্ধ্যা মুখার্জী সারা জীবন Falsetto গলায় গান করে গেলেন। কি করে যে এমন জনপ্রিয় হলেন, আমার কাছে রহস্য। তুলনায় গীতা দত্তর গলা কি সুন্দর ছিল! সন্ধ্যা মুখার্জী দুটো একটা হিন্দী ছবিতে গানও গেয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবেননা বলে চলে এলেন বম্বে থেকে, না অন্য কারণে চলে এলেন জানা নেই।

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

08-09-17

জয়েনপুরের মাছের পাইকারি বাজার হয়ে দ্রুতগতিতে ফিরছি। হঠাৎ একটা দশ-বারো বছরের ছেলে –পেছন থেকে আসছিল সাইকেল করে – একটু সামনে গিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, সু-লেস (জুতোর ফিতে বললনা) খুলে গেছে। নীচে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তো! বা পায়ের জুতোর ফিতে খুলে গেছে। আমি খেয়ালই করিনি।
এই প্রথমবার না। অনেকবারই আমার জুতোর ফিতে খুলে গেছে, সকালে হাঁটার সময়। একটা পায়ের জুতোর ফিতে। কখনো বা পায়ের, কখনো ডান পায়ের। কখনো মনে হয়নি, এ নিয়ে কোনো গবেষনা করা দরকার। কিন্তু এ নিয়ে দেখা যাচ্ছে, বিদেশে গবেষনা হয়েছে।

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/12/scientists-unravel-mystery-of-the-loose-shoelace

Things can start to unravel at any moment, but when failure occurs it is swift and catastrophic. This is the conclusion of a scientific investigation into what might be described as Sod’s law of shoelaces.

The study focused on the mysterious phenomenon by which a shoe is neatly and securely tied one moment, and the next a flapping lace is threatening to trip you up – possibly as you are running for the bus or striding with professional purpose across your open-plan office.

++

16-10-17

TV serial কুন্দ ফুলের মালা। কি যে হয় এইসব ধারাবাহিকগুলোতে কে জানে। আমি দেখিনা। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো চোখে পড়ে। মনে হয়, নায়িকা এক বিশুদ্ধ প্রকৃতির মহিলা। তাকে নিয়েই গল্প গড়াচ্ছে।

যাই হোক, কুন্দফুলটা কি জানার জন্য, গুগল করলাম। ধবধবে সাদা ফুল। মাঘ মাসে হয়। সংস্কৃতে ‘মাঘমল্লিকা’। একধরণের jasmine (Downy jasmine)। বাংলায় চামেলিও বটে। মনিপুরে কুন্দফুলের মালা বদল করে বিয়ে হয়।

In Indian mythology the expression is as white as Kunda (like as white as snow in western literature). Also, beautiful white teeth are described as Kunda buds in India mythology.

In Manipur, the bride garlands the groom with two Kunda garlands. The groom then keeps one of them, and garland the bride with the second.

Kundah is one of the 1000 names of Lord Vishnu.

So, Kundah represents purity, knowledge, beauty, growth, prosperity, patience and selflessness. These qualities are essential in the running of a successful marriage relationship.

কবিতা 'দুঃসময়' রবি ঠাকুর

.....এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজাগরগরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ **কুন্দকুসুমরন্জিত,**
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুন্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা।
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।....

'লেখন' রবি ঠাকুর

.....**কুন্দকলি** ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তার লাজ,
পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।
বসন্তের বাণীখানি আবরণে পরিয়াছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।।.....

রচনা 'ছন্দ' রবি ঠাকুর

....চামেলির ঘনছায়া-বিতানে
বনবীণা বেজে ওঠে কী তানে।
স্বপনে মগন সেথা মালিনী
কুসুমমালায় গাঁথা শিথানে।।.....

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

25-08-17

অমিতাভ,

ভাল আছ? আশা করি সব সুকুশল।

একটা ইংরেজী রচনা পড়ছি: "Islam's Great Schisma (Shia vs Sunni)" পড়তে পড়তে মনে পড়ল, Wolfenden Hostel-এ পঞ্চম বছরে, দোতলায় এক মুশলমান Tea Pantry-দেখাশোনা করত। ও সুন্নি ছিল। একবার, কথা বলতে বলতে শিয়াদের বিরুদ্ধে প্রচুর রাগের কথা বলেছিল। ওর নামটা মনে পড়ছেনা। তোমার মনে আছে?ওর বেশ কয়েকটা ছেলেপুলে ছিল। বড়টার (ছেলে) নাম ছিল সেলিম এটা মনে আছে।

++++++++++++++++++++++++++++++++++

20-08-17

সম্পূরণ,

তোর **recycle** করা 'মেঘে ঢাকা তারা'র ওপর লেখাটার প্রচুর সংখ্যায় **আনন্দ-প্রাপ্তদের** পোষ্ট এসেছে। আজকেও একটা এসেছে। **সুন্দর খুব সুন্দর।** অন্যদিকে 'মেঘে ঢাকা তারার' ওপর যে link-টা পাঠিয়েছি, সেটা ব্যবহার করে বিদেশী এক সমালোচকের সমালোচনা কেউ পড়েছে বলে মনে হয়না। That includes you। **কেউ পড়লে ব্যাপারটা বিস্ময়কর হোত।**

ঋত্বিক ঘটকের এই ছবি লাভের মুখ দেখেছিল ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় সমালোচনা খুব একটা উচ্চ স্তরের হয়েছে বলে মনে হয়না। **ভাল ছায়াছবি দেখে ভাল সমালোচনা করা বাঙ্গালীর কর্ম না।** 1959 সালে বার হওয়া 'মেঘে ঢাকা তারা' একেবারে সেই 1994-এ ইওরোপে দেখানো হয়। যদি এটা 1959/60 সালে দেখানো হোতো, তাহলে সত্যজিত রায়ের position-(সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রপরিচালক) এর বারোটা বেজে যেত। **Satyajit Ray was immensely lucky.** একবার যখন সত্যজিত রায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক বলা হয়ে গেছে তখন ওটার অন্যথা কি করে করা যায় বল**!**

এইবার, কয়েকটা বিদেশী সমালোচনার অংশ পড়।

1) It took many years for Ritwik Ghatak's classic *Meghe Dhaka Tara* (*The Cloud-Capped Star*, 1960) to be widely seen and recognised outside its home country of India. **What a loss for the global consciousness of world cinema in those years**
2) The Cloud-Capped Star is '**one of the five or six greatest** melodramas in cinema history'.
3) **One of the "ten best films of all time."** – John Powers, *LA Weekly*
4) *The Cloud-Capped Star* is undoubtedly a modern masterpiece - infinitely compassionate and humane while remaining resolutely unsentimental**.**

---

5) There are historical and political depths to this film, as in every Ghatak film; but it is these elements of intimate, family melodrama that I wish to stress in this brief tribute – not just as a matter of content, but above all as a matter of form, film language, style. **For Ghatak is among cinema's greatest and most radical stylists.**
6) Was 1960 the last moment in world cinema history that a man could make such a film about a woman, about the so-called 'plight of woman' - and not only get away with it, but forge the highest art out of it, an art of deep empathy that elicits our equally deep respect and admiration? There is a tradition of such films by men about women, a tradition we have come to love, understand and value long after it came to an end. This tradition includes films by Cukor and Sirk and Ophuls, by Rosselini and Dreyer, and most particularly by Ozu, Naruse and Mizoguchi
7) It is Ritwik Ghatak's way of presenting this melodrama in *Meghe Dhaka Tara* which is really so special. He is famous for his unusual stylistic experiments, no matter the limitations of the technology at his disposal in his time and place. **Many of his experiments now seem as if they were years, even decades ahead of their tim**e.

Dipak

++

05-08-2017

তানিয়ার বড় মেশোমশায়ের একটা দল আছে, নিজের নিজের গাড়ী নিয়ে (বা কয়েকজন একত্র একত্র হয়ে বা 'পুলকার' ব্যবস্থা করে) দূরের জায়গায় চলে যাওয়া। এ ব্যাপারে একদিন আলোচনা হচ্ছে তানিয়াদের বাড়ীতে। ওর আগে ওনারা মেদিনীপুর পুরুলিয়ার কোন অঞ্চলে গিয়েছিলেন। কথায় কথায় "**গনগনির মাঠের**" কথা উঠল। স্থানীয় কেউ এই মাঠের কথা বলেছিল, কিন্তু ওনাদের ওখানে আর যাওয়া হয়নি। আশ্চর্য, এই দুটো শব্দ-বন্ধনী এই ঘটনার পূর্বে অনেকদিন আগে শুনেছিলাম।আমি যখনি কোন বড় খোলা মাঠ দেখি, আমার এই "**গনগনির মাঠ**" কথাটা মনে পড়ে। এ দুটো শব্দের মধ্যে আমার কিছু একটা মোহ লাগে, যার জন্য এই শব্দ-বন্ধনীর কথা ভুলতে পারিনি।

সুবোধ ঘোষের লেখা "কিংবদন্তীর দেশে" বইটা পড়েছিলাম স্কুলে থাকা কালীন। অবসর নেওয়ার পর বইটার খোজে ছিলাম। আবার পড়ব বলে। পেয়ে গেলাম, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রীয় পাঠাগারে। স্মৃতির সোপান-সারি বেয়ে পিছনে ফিরে গেলাম। বইটা থেকে দুটো অনুচ্ছেদ লিখছি এখানে।

'"**কিংবদন্তীর দেশ**' অবশ্য এই ধরণের নিছক কল্পনাসম্ভব কোনো দেশ নয়। কিংবদন্তীর দেশটা খুবই বাস্তব ও সত্য। কারণ কিংবদন্তীর ঘটনাস্থল স্বচক্ষে দেখা যায়। কিংবদন্তীগুলি হল অর্ধেক ইতিহাস আর অর্ধেক কল্পনা..."

"...ঐ সেই শিলাবতী নদী। আর নদীর তীরে ঐ মাঠের নাম গনগনির মাঠ।...কে জানে কত হাজার বছর ধরে উত্তর মেদিনীপুরের অরণ্য আর জীবনের হর্ষ ও বেদনা শিলাবতীর জলে এইভাবে ভাসিয়ে দিয়ে আসছে।.....বগড়ি-কৃষ্ণনগরের কাল্পনিক ইতিহাস গনগনির মাঠে বকরাক্ষসের অস্থি হয়ে পড়ে রয়েছে আর সত্যিকারের ইতিহাসের পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণরাজির মন্দির।**.....অনেকেই মনে করেন এক লোভী বিশ্বাসহন্তার চতুরতায় ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে বিদ্রোহী অচল সিংহ প্রাণদন্ড বরণ করেছিলেন যে ফাঁসির রজ্জুতে কণ্ঠ সঁপে দিয়ে, সেই রজ্জুকে ধারণ করার বেদনা সহ্য করতে না পেরে পাথর হয়ে গিয়েছিল গনগনির মাঠ।"**

++++++++++++++++++++++++++++++

29-10-17

সন্ধ্যায় প্রবীর (গু) ফোন করেছিল। "তাড়াতাড়ি লেখাটা শেষ কর"।

কাজেই বন্ধুরা! এবারের মত লেখা শেষ।

মহানন্দের খোঁজে

নীল আকাশে বিহংগ যেমন
করে ভয়শুন্য অবাধ বিচরণ,
হয়না তাদের কোন অংগ হানি
থাকেনা কোন পিছু টান।

মেঘ চলে ছোট বড় দলে
কখনো বেগে কখনো হেলে দুলে।
জানা নেই কোথা হতে এসেছে,
কোথায় বা যেতে হবে শেষে।

বারি বারি জল রাশি, হয়ে নদ নদী
ছুটে চলে আবেগে মিলিতে সাগরে।
বিশাল তরঙ্গ মেশে একে অপরের সংগে,
চুমে তট দেশ, ফিরে যাবে মহানন্দে।

অতীত কখন আসবেনা ফিরে,
ভবিষ্যৎ কেও যাবেনা জানা।
বর্তমান সেও তো অধরা চলমান,
থাকবেনা থেমে একটু ক্ষণ।

কিসের তবে এত ছোটাছুটি,
কিসের তবে এত তাড়া।
চলবো আমি, ছুটবো আমি
যেমন ছোটে শ্রোতের ধারা।

চিত্ত নির্মল, বিকশিত করে মন
সবারে করবো আহবান।
ধরণীর বুকে হয়েছে পরিচিত,
প্রাণপ্রিয় আত্মীয় যত।

কিছু নেই পাবার, কিছু নেই দেবার
রয়েছে শুধু সময়কে হারাবার।
সবাই আমরা আনন্দই তো চাই,
অনন্তের মাঝে অতীত ভবিষ্যৎ কিছু নাই।

আমাদের চেষ্টা হোক সর্বক্ষণ,
আনন্দের মাঝে যেন করি বিচরণ।
জগতের সবাই বন্ধু, কেউ নয় অচেনা।
অমৃতের পুত্র মোরা, মহানন্দের করবো বন্দনা।

অধীর দাস

স্টাচু অফ ইকিউয়ালিটি

আমরা স্টাচু অফ লিবারটি শুনেছি। ইদানীং স্টাচু অফ উনিটির কথা শুনছি। কিন্তু স্টাচু অফ ইকিউলিয়াটির কথা এখনো বোধ হয় অনেকে শোনেননি।
হ্যাঁ, আমি সেই স্টাচুর কথাই বলতে যাচ্ছি যা সম্প্রতি তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষের এক মহান ধর্মগুরু রামানুজাচার্যের পূন্য স্মৃতিতে। এই বছর ২০১৭ তে সেই মহান পুরুষ আচার্য, দ্বিতীয় জগতগুরুর সহশ্র বছর আবির্ভাব দিবস পূর্ণ হবে, সেই মহা লগ্নের স্মরণে।
এখানে বলেরাখি ইদানীং আর একটি 'স্টাচু অফ ইকিউলিয়াটির' কথা শোনা গেছে। সেটি ভারতরত্ন বাবাসাহেব আম্বেদকারের স্মৃতিতে মুম্বাই শহরে স্থাপন করার কথা। সরকারি ভাবে ঘোষণা হলেও স্টাচু তৈরিরর কাজ এখনও শুরু হয়নি। নামটি শেষ অব্দি 'স্টাচু অফ ইকিউয়ালিটি'ই রাখা হবে কিনা সেটাও নিশ্চিত করে বলা যায়না।

যাই হোক আমরা যে স্টাচু অফ ইকিউয়ালিটির কথা বলছি তাতে ফিরে যাই। এই স্টাচু নিরমান খবরটি আমার কাছে এক ভীষণ আনন্দ সংবাদ বলে মনে হয়েছে। আমরা সচারচর বর্তমান কালের রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবী, বড়োজোর কিছু দেব দেবতার নামাঙ্কিত স্টাচুর কথা শুনেছি বা দেখেছি। কিন্তু আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রবক্তা, মহান আচার্য (বর্তমান সভ্যতার) এদেরকে এভাবে স্মরণ করার ব্যাবস্থা করার কথা আগে শোনা যায়নি।

আদি শংকরাচার্য আনুমানিক ১৫০০ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কেরল প্রদেশে। তিনিই ছিলেন হিন্দু ধর্মের প্রথম 'জগতগুরু। তিনি তখনকার সময়ে কালের অমোঘ নিয়মে রিক্ত, ক্লিষ্ট হয়ে থাকা হিন্দুধর্মকে পুনরাপুত্থাপন করেন। আজকের হিন্দু ধর্ম বলতে আমরা যতটুকুই জেনেছি বুঝেছি বা ধারণা করতে পারছি তা তাঁরই দান।
অতি বাল্যকালের মধ্যে লুপ্তপ্রায় বৈদিক শাস্ত্র সম্পূর্ণ রুপে অধ্যায়ন করে তার বহু ভাষ্য ও নতূন কাব্য গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। পরিব্রাজক রুপে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে ভারতে অবস্থিত মনুষ্য সভ্যতার প্রাচীনতম ধর্মীয় জ্ঞান বা বৈদিক জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার করেন। তিনিই প্রথম 'অদ্বৈতবাদ 'এর প্রবক্তা ঃবেদের বাণী "তত্বমসি" , "অহম ব্রহ্মাস্মি" কে আর একবার জনমানসে তুলে ধরেন।
তিনি প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করেন ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর নির্গুণ, নির্বিশেষ,

নিরাকার ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম সত্য , জগত মিথ্যা এই ধারণার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনিই জীবনের শেষে এও ঘোষণা করেন ভগবান অকারণ করুণাময়। শুধু তাই নয়, ভারতের চার প্রান্তে মন্দির নির্মাণ করে যান যা আজ চারধাম নামে সখ্যাত। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এই মহাপ্রাণ মহাজ্ঞানী জগতগুরু তার লীলা সম্পন্ন করেন।
কথিত আছে তিনি শিবের অবতার ছিলেন এবং ভগবান সম্বন্ধে তাঁর ঐ মতবাদ তখনকার সময়ের সামাজিক ও ধার্মিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতা থেকে অনুকূলতায় আনার জন্য এই ভাবেই আদিষ্ট হয়েছিলেন। পরিবর্তী কালে তাঁর মতবাদে কিছু বিবাদের সৃষ্টি অবশ্যই হয়েছিল।

ফিরে আসা যাক দ্বিতীয় জগতগুরু রামানুজাচার্য যার নিমিত্ত এই স্টাচু অফ ইকিউয়ালিয়টি তাঁর কথায়। তিনিও ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে , বর্তমান চেন্নাই শহরের অদূরে 'পেরামপদূর' নামক এক প্রান্তিক শহরে জন্ম লাভ করেছিলেন এই মুহূর্তের ঠিক ১০০০ বছর আগে।
অগাধ পাণ্ডিত্য , শ্রুতিধর শৈশবকালেই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যায়ন সমাপ্ত করেন। তাঁর দেহ সৌন্দর্য ও দীপ্ত জ্ঞান আপামর জনগনকে তো বটেই সেই সময়ের সমস্ত আচার্যদের ও আকৃষ্ট করতো তাঁকে শিষ্য রুপে পেতে। অতি সত্বর বালক রামানুজ কোন কোন শ্লোকে আচার্য গুরুর ব্যাখ্যার ত্রুটি ও সম্পূর্ণ ভীন্ন ধরণের অর্থের অবতারণা করতে থাকেন। তাঁর এই কাজ তাঁর জীবনকেও বিপন্ন করে তুলেছিল সতীর্থ , গুরু ও কিছু আচার্যদের রোষানলে পরে।
তিনি কাঞ্চিপুরম শহরে অনেকদিন স্থায়ী ভাবে বাস করে কাঞ্চিপুরমকে দেশের বৈদান্তিক জ্ঞান চরচার প্রসার ও প্রচার কেন্দ্র করেছিলেন। তিনি বেদ বেদান্ত , ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদির বিভিন্ন গ্রন্থের নতুন ভাষ্য লেখেন। তার ব্যাখ্যা ও নতুন মতবাদ জনমানসে খুব সমাদৃত হতে থাকল।
তিনিই শংকরাচার্য এর মতবাদ থেকে সরে গিয়ে ঘোষণা করলেন বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ। যার অর্থ ভগবান বা ব্রহ্ম নির্গুণ , নির্বিশেষ , নিরাকার নন। তিনি সগুন সবিশেষ, সাকার। জীব ও ভগবানের পৃথক ও স্বাতন্ত্র্য স্বত্বা আছে। তিনি আরও এগিয়ে বললেন--সকল জীবেরই আছে সমান ক্ষমতা , সমান অধিকার ভগবৎ কৃপা ও তার সান্নিধ্য লাভের। তিনি এও বললেন সমাজে মানুষের মাঝে কোন প্রকার ভেদ থাকতে পারে না। তিনি সব মন্দিরের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দানাবাঁধা জাত-পাতের অভিশাপ এই প্রথম ভীষণ ভাবে ধাক্কা

খেল এবং তা থেকে মুক্তির পথ দেখতে পেল।
ভক্তি দিয়ে জীবনকে জয় করা যায়, ভগবানকে পাওয়া যায় এ কথা প্রচার করে বেড়ালেন উত্তর দক্ষিণ সমস্ত প্রান্তে একাধিক বার। ঘোষণা করলেন বেদ, বেদান্ত অভ্রা এবং তাকে মুক্ত করলেন সমস্ত বিকৃত ব্যাখ্যা ও রূপ থেকে। ধর্ম মানুষের বোঝা নয়, ধর্ম জীবনের পরিপূরক, আনন্দ প্রাপ্তির সহায়ক তা মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ত্রিচুরাপল্লীর , শ্রীরংগমে ভগবান মহাবিষ্ণুর 'শ্রীরংগনাথস্বামী ' মন্দিরের আচার্য পূজারী রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের পুরোধা ও সমর্থক ছিলেন। তিনি তাঁর জিবদ্দশ্যায় রামানুজকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন। রামানুজ তাঁর ডাকে সারা দিয়ে মন্দিরে পৌছনোর পূর্বেই আচার্যদেব ইহলোক ত্যাগ করেন। তদোবধি রামানুজ শ্রীরংগম মন্দি মহাবিষ্ণুর সেবক হয়ে কাটান তার দীর্ঘ ১২০ বছরের জীবনের শেষদিন পরজন্ত। মূল মন্দিরের পাসে তাঁর সমাধিস্ত মন্দির এখনও রয়েছে।

হিন্দু ধর্ম যা মূলত বৈষ্ণব ধর্ম , ভগবান বিষ্ণুর পূজা,ভবানে ভক্তি এবং ভক্তির মাধ্যমেই ভগবান প্রাপ্তি শুধু সম্ভবই নয়, তাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই বাণী দৃড় করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই যুগপুরুষ মহাযোগী ছিলেন আমাদের দ্বিতীয় জগতগুরু।
তার ঘোষিত পথেই এই ভৌতিক জীবনে আধ্যাত্মিক ভাব ধারায় আমরা স্নাত হবার চেষ্টা করতে পারি। তাই তাঁর স্মৃতি কল্পে এমন এক ভব্য স্মারক মন্দির ও মূর্তি (স্টাচু) গঠন আজকের দিনে ১০০০ বছর পরেও এখনো যেখানে যাত পাতের অসমতা রয়েছে এবং অসমতা থেকে হিংসা রয়েছে তখন তাঁকে বিশেষ ভাবে এবং স্থায়ী রূপে স্মরণ করার যারা উদ্যোগ নিয়েছেন তারা নিশ্চয় সাধুবাদ যোগ্য।

সংবাদপত্র মাধ্যমে যা জেনেছি, এই স্টাচু অফ ইকিউয়ালিটি তৈরি হয়েছে হায়েদ্রাবাদ শহরের সামসাবাদ নামক যায়গায়। মূর্তিটি উষ্চতায় ২১৬ ফিট, ত্রিদন্ডি হাতে জগতগুরু বসে আছেন। এইটিই হবে বসে থাকা অবস্থায় বিশ্বের দ্বিতীয় সরবোচ্চ মূর্তি বা স্টাচু। বসে থাকা অবস্থায় সরবোচ্চ মূর্তিটি হচ্ছে থাইল্যান্ডের বুদ্ধ মূর্তি যা উষ্চতায় ৩০০ ফিট। দাড়ান অবস্থায় আমেরিকার স্টাচু অফ লিবারটির উষ্চতা ১৫০ ফিট। ভারতে অধুনা যে মূর্তি টি তৈরি হচ্ছে (দাড়ান) গুজরাটের বদোদরা শহরের কাছে তার নাম স্টাচু অফ উনিটি। স্বাধীনতা প্রেমী , মহান নেতা সরদার বল্লবভাই

প্যাটেলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে , তার অসাধারণ দেশপ্রেম , স্বাধীনতা সংগ্রাম , ও দেশের অখন্ডতার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। এই স্টাচুর উচ্চতা হবে ৬০০ ফিট।

এমন এক প্রতিভাধর , মহান আত্মা জগতগুরু সম্বন্ধে জানার উৎসাহ অনেকদিন ধরেই ছিল, কিন্তু বংগ দেশে, বংগ ভাষায় স্বল্পায়াসে তেমন কিছুই পাইনি। কর্ম সূত্রে চেন্নাই থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মঠের পাঠাগারে প্রথম একটি পুস্তকের সন্ধান পাই--"শ্রী রামানুজ চরিত"। বইটির লেখক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য , শ্রী রামকৃষ্ণ বিগ্রহের নিষ্ঠাবান পূজারী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর আদেশে ১৮৯৭ সালেই চেন্নাই প্রদেশে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনা করেন। স্বল্পায়ু স্বামীজী জীবনের শেষ ৭/৮ বছর চেন্নাই শহরে থাকাকালীন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মঠ ও মিশন, শহরে বালিকা বিদ্যালয় , বেদান্ত পাঠ কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনা করেন। তিনি রামানুজনের জন্ম ও স্মৃতি বিজরিত স্থান , বিভিন্ন পাঠাগারে গিয়ে এক বিশেষ অনুসন্ধান মূলক লেখ লেখেন যা সংঘের উদ্বোদন পত্রিয়ায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর তা পুস্তাকাকারে প্রকাশ পায়। জগতগুরু শ্রী রামানুজাচার্য দেবের মহানত্ব এই থেকেই আমরা খানিকটা আঁচ করতে পারি।
এমন অসাধারণ মনিষী তুল্য বিরাট ব্যাক্তিত্বের যোগ্য স্মৃতি রক্ষণ খুবই আনন্দ সংবাদ। বিশাল মূর্তি সংলগ্ন থাকবে বেশ কিছু মন্দির , মহামানবের জীবনগাথার উপরে এক মিউসিয়াম, বৃহত পাঠাগার যা বৈদিক শাস্ত্র ভান্ডারে সমৃদ্ধ থাকবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উদ্যোক্তরা অবশ্যই আশীর্বাদ ধন্য হয়ে থাকবেন।

অধীর দাস।